

सक्रा
विश्राए

The Siege of Mecca by Yaroslav Trofimov

জুহাইমান আল-উতাইবির কাবা দখল ও সৌদ পরিবারের
বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের আদ্যোপান্ত

মক্কা বিদ্রোহ

ইয়ারোস্লাভ ত্রোফিমভ

ডা. আবু বকর সিদ্দীক
অনূদিত

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ
সম্পাদিত

ফাউন্টেন

পা ব লি কে শ ল



প্রকাশকের কথা

ইতিহাসের কিছু ঘটনা এমন আছে, যেগুলো শুধু ইতিহাসের ঘটনা হয়েই থাকে না। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও তা মানুষের স্মৃতি, বিশ্বাস, রাজনীতি ও মানসজগতে এক দীর্ঘ ছায়া ফেলে যায়। ১৯৭৯ সালের মক্কা বিদ্রোহের সেই ঘটনা ইতিহাসের তেমনই একটি অধ্যায়—যা একই সঙ্গে বিস্ময়কর, বেদনাদায়ক এবং অস্বস্তিকর।

কারণ ঘটনাটি ঘটেছিল এমন এক স্থানে, যাকে পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান নিরাপত্তা, পবিত্রতা ও অভিন্নতার প্রতীক হিসেবে জানে। মসজিদুল হারাম—যেখানে অস্ত্রের উপস্থিতিই অকল্পনীয়, সেখানে সশস্ত্র একটি দল প্রবেশ করে মসজিদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল; হাজি ও মুসল্লিরা হয়ে গেলেন অবরুদ্ধ; আর পবিত্র কাবার প্রাঙ্গণ পরিণত হলো বন্দুকের গুলির শব্দে মুখরিত এক যুদ্ধক্ষেত্র।

কিন্তু ‘মক্কা বিদ্রোহ’-এর গুরুত্ব কেবল এই ভয়াবহতার মধ্যে নয়। বরং এর প্রকৃত গুরুত্ব নিহিত রয়েছে আরও গভীরে; এই প্রশ্নে যে, কীভাবে এমন একটি ঘটনা সম্ভব হলো?

কীভাবে একদল মানুষ এমন এক বিশ্বাসে উপনীত হলো যে, তাদের হাতে সংঘটিত এই রক্তক্ষয়ী অভিযানকে একটি ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবেই তারা দেখছিল? কীভাবে জুহাইমান আল-উতাইবির মতো একজন মানুষ তার চারপাশে অনুসারীদের এমনভাবে সংগঠিত করতে সক্ষম হলেন? কেন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-কাহতানিকে মাহদি হিসেবে ঘোষণা করা হলো? কেন সৌদি রাষ্ট্রের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কাঠামো এত বড় একটি পরিকল্পনার ব্যাপারে অন্ধকারে রয়ে গেল? আর কীভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে পৃথিবীর অন্যতম

পবিত্র স্থানে একটি সশস্ত্র অবরোধ চলতে পারল?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে কেবল ২০ নভেম্বর ১৯৭৯-এর সেই সকালটিতে ফিরে তাকালেই হবে না। ফিরে যেতে হবে তারও বহু আগে—সৌদি রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাসে, রাজপরিবার ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতরে, সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এবং তেলের বিপুল অর্থে বদলে যাওয়া একটি দেশের অন্তর্গত টানাপোড়েনে। কারণ ইতিহাসে বড় বিস্ফোরণগুলো সচরাচর বিস্ফোরণের মুহূর্তে জন্ম নেয় না; তার উপকরণ বহুদিন ধরে জমা হতে থাকে।

এই জায়গাতেই ‘মক্কা বিদ্রোহ’ কেবল একটি অবরোধের বিবরণ হয়ে ওঠে না। এটি হয়ে ওঠে একটি সময়কে বোঝার দরজা।

বহু ঐতিহাসিক ঘটনার মতো মক্কার এই ঘটনাটিও দীর্ঘদিন নানা গল্প, গুজব, অসম্পূর্ণ তথ্য ও পরস্পরবিরোধী বর্ণনার আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল। কে ছিল এই বিদ্রোহের নেপথ্যে, তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল, রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, সামরিক অভিযান কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং বিদেশি সহায়তার প্রকৃতি আসলে কী ছিল—এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে জনপরিসরে কম বিভ্রান্তি নেই।

একজন পাঠকের জন্য এখানেই এই বইটির বিশেষ মূল্য।

কারণ ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য কেবল কোনো ঘটনার ‘কী ঘটেছিল’ জানা নয়; বরং কেন ঘটেছিল—তা বোঝা। আর এই ‘কেন’-এর অনুসন্ধানই ইতিহাসকে নিছক ঘটনাপঞ্জি থেকে চিন্তার বিষয়ে পরিণত করে।

‘মক্কা বিদ্রোহ’ সেই অর্থে আমাদের সামনে একটি কঠিন প্রশ্নও রেখে যায়: ধর্মীয় ভাষা যখন রাজনৈতিক ক্ষোভ, সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া এবং ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে যায়, তখন তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। বরং এই বই পড়তে গিয়ে পাঠককে

হয়তো একাধিক অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। এবং একটি ভালো ইতিহাসগ্রন্থের সার্থকতা এখানেই—সে পাঠককে কেবল তথ্য দেয় না; তার পূর্বধারণাগুলোকেও প্রশ্ন করতে শেখায়।

তবে বইটি পড়ার সময় একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। এটি কোনো ধর্মীয় আকিদা বা মতাদর্শের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয়; এটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও ইতিহাসের উপাদান ব্যবহার করে একটি জটিল ঐতিহাসিক ঘটনার পুনর্গঠনের প্রয়াস। প্রত্যক্ষদর্শী, সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক সদস্য, কূটনীতিক এবং বিভিন্ন দলিলের সূত্র ধরে লেখক দীর্ঘদিনের অঙ্ককারে থাকা ঘটনাটিকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন।

একজন প্রকাশক হিসেবে আমার কাছে এ ধরনের বইয়ের গুরুত্ব এখানেই—এগুলো আমাদের পরিচিত ইতিহাসের এমন কিছু দরজা খুলে দেয়, যেগুলোর সামনে আমরা প্রায়ই দাঁড়াই, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করি না।

মক্কার কাবা অবরোধ নিয়ে হয়তো পাঠকের নিজস্ব ধারণা আছে। হয়তো কোনো গল্প শুনেছেন, কোনো ভিডিও দেখেছেন, কোনো বক্তৃতায় একটি ব্যাখ্যা শুনেছেন। কিন্তু ইতিহাসকে জানার সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা হলো—যখন আমরা কোনো ঘটনার সম্পর্কে ‘জেনে গেছি’ বলে ধরে নিই। কারণ তখন নতুন তথ্য আর আমাদের কাছে পৌঁছায় না; আমরা কেবল নিজের পূর্বধারণার সমর্থন খুঁজি।

‘মক্কা বিদ্রোহ’ সেই নিশ্চয়তাটুকুকে নড়িয়ে দিতে পারে।

এ বই পড়ার পর ১৯৭৯ সালের সেই ঘটনাকে হয়তো আর শুধু ‘কাবা দখলের ঘটনা’ বলে মনে হবে না। এর পেছনে দেখা যাবে মানুষ, বিশ্বাস, ক্ষমতা, রাষ্ট্র, সামাজিক পরিবর্তন, ক্ষোভ এবং ইতিহাসের দীর্ঘ প্রবাহ—যেগুলো একসময় এসে বিস্ফোরিত হয়েছিল ইসলামের পবিত্রতম স্থানগুলোর একটিতে।

বাংলা ভাষায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। একই সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকের জন্য এই বই কেবল একটি অতীতের ঘটনা জানার উপকরণ হবে না; বরং ইতিহাস কীভাবে পড়তে

৮ ♦ মক্কা বিদ্রোহ

হয়, প্রচলিত বয়ানকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় এবং একটি জটিল ঘটনার পেছনে থাকা বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে কীভাবে দেখতে হয়—তারও একটি অনুশীলন হয়ে উঠবে।

কারণ ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর অধ্যায়গুলো কেবল আমাদের অতীত সম্পর্কে বলে না। কখনো কখনো তারা আমাদের বর্তমান সম্পর্কেও সতর্ক করে।

—আবদুর রহমান আদ-দাখিল

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



অনুবাদকের কথা

১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর। মাহদি আগমনের দাবি নিয়ে জুহায়মান আল-উতাইবির নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী যখন ইসলামের পবিত্রতম স্থান কাবা শরিফ দখল করে নেয়, তখন গোটা বিশ্বই যেন থমকে গিয়েছিল। টানা দুই সপ্তাহ ধরে চলা সেই রক্তক্ষয়ী সংঘাত সৌদি আরবের রাজতন্ত্রকে কাঁপিয়ে দেয়ার পাশাপাশি একুশ শতকের বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির দিকনির্ণয়ও করে দিয়েছিল।

ইয়োরোল্লাভ ত্রোফিমভ তার অসাধারণ গবেষণালব্ধ *The Siege of Mecca: The Forgotten Uprising in Islam's Holiest Shrine* বইতে সেই রক্তাশ্বাস দিনগুলোর আদ্যোপান্ত তুলে ধরেছেন। দীর্ঘকাল ধরে ধামাচাপা দিয়ে রাখা এই ঘটনার নেপথ্য কারণ, পবিত্র কাবার ভেতরে চলা লড়াইয়ের ভয়াবহতা এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে এমন প্রামাণ্য দলিল দ্বিতীয়টি নেই।

একজন অনুবাদক হিসেবে আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল মূল লেখকের বর্ণনার সেই সাবলীলতা এবং ঘটনার গুরুত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা। ইতিহাসের পাতায় ডুবে গিয়েও পাঠক যাতে কোথাও যান্ত্রিকতার স্বাদ না পান, সেজন্য আমি প্রাঞ্জল ও গতিশীল গদ্যশৈলী বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। কীভাবে ১৯৭৯ সালের সেই ভোরবেলার একটি ঘটনা আজকের মধ্যপ্রাচ্যের জটিল রাজনীতির বীজ বুনে দিয়েছিল—এই বই আমাদেরকে সেটাই উপলব্ধি করাবে। আমি আশাবাদী, ইতিহাসের সত্য সন্ধানী পাঠকদের কাছে এই অনুবাদটি একটি প্রয়োজনীয় সংগ্রহ হিসেবে সমাদৃত হবে।

ডা. আবু বকর সিদ্দীক
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ



সম্পাদকের বক্তব্য

মক্কার কাবা প্রাঙ্গণে তখন রক্ত ঝরেছে!

মিনারের ওপর অবস্থান নিয়েছে সশস্ত্র লোকজন। মসজিদের দরজা বন্ধ। ভেতরে আটকা হাজার হাজার মুসল্লি ও হাজি। গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই প্রাঙ্গণে, যেদিকে মুখ করে পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান প্রতিদিন নামাজ পড়েন।

ঘটনাটি ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বরের। হিজরি ১৪০০ সালের প্রথম দিন। ফজরের নামাজ শেষ হবার পরপরই জুহাইমান আল-উতাইবির নেতৃত্বে একদল অস্ত্রধারী মসজিদুল হারামের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তারা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-কাহতানিকে প্রতিশ্রুত মাহদি ঘোষণা করে এবং শুরু হয় প্রায় দুই সপ্তাহের এক রক্তক্ষয়ী অবরোধ। জুহাইমানদের দিক থেকে দেখলে, এটি এক বিদ্রোহ। সৌদি রাজপরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যা সংঘটিত হয় পবিত্র মক্কা শহরে। সেই থেকে এ বইয়ের নাম ‘মক্কা বিদ্রোহ’।

এ বইটির সম্পাদনার কাজ আমার কাছে অনেকটা হঠাৎ করেই আসে। অনুবাদক ডা. আবুবকর সিদ্দীক ভাই নিজে থেকে যোগাযোগ করে বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। বিষয়টি আমার কাছে আগ্রহের ছিল। তবে এর মধ্যে একটা মজার কাকতালও ছিল। ঠিক সেই সময় আমি ’৭৯ সালের কাবা দখল নিয়ে একটি ভিডিও কন্টেন্ট তৈরির কাজ করছিলাম, তখনও কাজটা রিসার্চ লেভেলে। আমি তখন ঘটনার বিভিন্ন সূত্র ঘাঁটছি, তথ্য সংগ্রহ করছি, একটি গোছানো বিবরণ দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি। এর মাঝেই সেই একই ঘটনা নিয়ে লেখা পূর্ণাঙ্গ একটি বই সম্পাদনার প্রস্তাব এসে হাজির হলো! আল্লাহ চান তো কী না হয়!

সত্যি কথা বলতে, কাবা দখল নিয়ে কাজ শুরু করার আগে ঘটনাটির কিছু বিষয় আমি ভুল জানতাম, এ বই পড়ার আগ পর্যন্ত আমার সেই ভুলগুলো ভাঙেনি। শুধু আমি নই, এ ঘটনা সম্পর্কে প্রচলিত আলোচনায় এমন বেশ কিছু ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। কে কাবা প্রাঙ্গণ দখল করেছিল, কেন করেছিল, বিদ্রোহীদের আসল দাবি কী ছিল, সৌদি বাহিনী কীভাবে অভিযান চালিয়েছিল এবং বিদেশি সহায়তার প্রকৃত ধরন কী ছিল, এসব নিয়ে বহু অতিরঞ্জিত ও পরস্পরবিরোধী বর্ণনা চালু আছে।

ইয়ারোস্লাভ ট্রফিমভের ‘দ্য সিজ অব মক্কা’ পড়তে গিয়ে সেই ভুল ধারণাগুলোর অনেকটাই পরিষ্কার হয়। বইটিতে সেই ভয়াবহ সকাল ও পরবর্তী দুই সপ্তাহের লড়াইয়ের বিবরণ উঠে এসেছে। এছাড়াও লেখক এর বহু আগে থেকে ঘটনার পটভূমি নির্মাণ করেছেন। জুহাইমান আল-উতাইবি কে ছিলেন, তার চিন্তাধারা কীভাবে গড়ে উঠেছিল, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-কাহতানিকে কেন মাহদি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং কীভাবে এত বড় একটি অভিযান সৌদি গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে গেল, বইটিতে এসব প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর রয়েছে।

ঘটনাটি এখানে কোনো বিচ্ছিন্ন উদ্গাদনা হিসেবে হাজির হয়নি। সৌদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, রাজপরিবারের সঙ্গে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সম্পর্ক, তেলের অর্থে দেশটির দ্রুত পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের ক্ষোভ, সব মিলিয়েই মক্কা বিদ্রোহের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপট না জানলে জুহাইমানের কর্মকাণ্ডকে কেবল একদল অস্ত্রধারীর হঠকারিতা বলেই মনে হতে পারে।

এটি কোনো ধর্মীয় বই নয়, পাঠকের এটা মাথায় রাখা জরুরি। এটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও ইতিহাসভিত্তিক একটি কাজ। লেখক প্রত্যক্ষদর্শী, সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক সদস্য, কূটনীতিক এবং বিভিন্ন দলিলের সাহায্যে দীর্ঘদিন আড়ালে থাকা একটি ঘটনা পুনর্গঠন করেছেন। সব বস্তুব্যয়ের সঙ্গে পাঠক একমত হবেন, এমন নয়। তবে কাবা অবরোধ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে এ বইটি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

১২ ♦ মক্কা বিদ্রোহ

আমার নিজের ভুল ধারণাগুলো যেমন এ বই থেকে অনেকটাই সংশোধিত হয়েছে, আশা করি পাঠকের কাছেও ঘটনাটি নতুনভাবে পরিষ্কার হবে। যে ঘটনা নিয়ে এত গল্প, গুজব ও অর্ধসত্য প্রচলিত, তার ভেতর থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুঁজে পেতে ‘মক্কা বিদ্রোহ’ গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করবে। অনুবাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতা এত চমৎকার একটি বই বাংলাভাষীদের জন্য উপহার দেয়ার জন্য!



আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

জুন ২০২৬

ঢাকা



ভূমিকা

পবিত্র মক্কা নগরী। সুনসান নীরবতা। মক্কার শুষ্ক পাহাড়ের আড়ালে উঁকি দিচ্ছিল নতুন হিজরি শতাব্দীর প্রথম প্রভাত। কাবা শরিফের ইমাম তার কাঁধে আলখাল্লা চাপিয়ে নামাজের ইমামতি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ফজরের নামাজ শুরু হতে তখন আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। কিছুদিন আগে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলেও মক্কা তখনও লোকে লোকারণ্য।

আজানের পর দ্রুতই ‘হারাম শরিফ’ মুসল্লি দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অনেকেই গত রাত হারাম শরিফেই তাসবিহ-তাহলিল করে কাটিয়েছিলেন। তাদের অনেকের সাথেই ছিল স্লিপিংব্যাগ কিংবা সুটকেস ও হ্যান্ডব্যাগ। স্বভাবতই কেউ সেগুলো তল্লাশি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। আবার অনেকের সাথে ছিল লাশের খাটিয়া। তারা তাদের প্রাণপ্রিয় স্বজনের জানাজার সালাতের জন্য অপেক্ষা করছিল।

তবে সেদিন অনেকগুলো খাটিয়াতে লাশের বদলে ছিল ভিন্ন কিছু। যেমন, কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল (AK-47), বেলজিয়ামে তৈরি এফএন-এফএএল বন্দুক (FN-FAL Rifle), বুলেট বেল্ট এবং অসংখ্য পিস্তল! আর সেই জনসমুদ্রের মাঝে লুকিয়ে ছিল শত শত ‘বিদ্রোহী’! তাদের কেউ কেউ কয়েকদিন ধরেই মসজিদের ভেতরে অবস্থান করছিল। এই অবস্থানকালে তারা মূলত হারাম শরিফের বিভিন্ন করিডোর এবং কক্ষের গোলকরাঁধা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। আবার কেউ কেউ সেদিন সকালেই তাদের নিজস্ব গাড়িতে করে মক্কায় প্রবেশ করেছিল। হারাম শরিফের গার্ডদের মনে যাতে কোনো সন্দেহের উদ্বেক না ঘটে, সেজন্য অনেকের সাথে তাদের স্ত্রী ও সন্তানাদিও ছিল। এই লোকদের অধিকাংশই ছিল সৌদি বেদুইন গোষ্ঠীর। তবে তাদের মাঝে অনেক ভিনদেশীও ছিল (এমনকি কিছু আফ্রিকান-আমেরিকান নওমুসলিম ব্যক্তিও)।

যারা হারাম শরিফের অভ্যন্তরে সেসব অস্ত্রের চোরাচালান নিয়ে এসেছিল, তাদের পরিকল্পনা ছিল বিশ্ব ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে পাল্টে দেয়া এবং এমন একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করা—যার মাধ্যমে অভিশপ্ত (মাগদুব) ও পথভ্রষ্ট (দাঙ্গিন) ইয়াহুদী-নাসারাদের নির্মূল করা হবে এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে।

সেই দিনটি ছিল ১৪০০ হিজরি বর্ষের প্রথম মাসের প্রথম তারিখ (১লা মহররম), এবং গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ২০ নভেম্বর, ১৯৭৯।



ভোর ৫.১৮। আকাশ সবেমাত্র ফর্সা হতে শুরু করেছে। হারাম শরিফের ইমাম সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করা মাত্রই গুলির আওয়াজ ভেসে আসে। হতভম্ব মুসল্লিরা দেখতে পায়, রাইফেল হাতে কিছু যুবক দ্রুত পায়ে কাবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসল্লিদের মাঝে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, “কী হচ্ছে এসব? কোনো গন্ডগোল হয়েছে কী? এই বন্দুকধারীরা কি কোনো জ্যেষ্ঠ যুবরাজ বা সৌদি বাদশাহ খালেদের দেহরক্ষী? না কি সৌদি রীতি অনুযায়ী নতুন বছর উদযাপন করা হচ্ছে?”

তবে কিছু মানুষের চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। কারণ তারা জানত যে, হারাম শরিফে অস্ত্র ব্যবহার কিংবা রক্তপাত তো গুরুতর গুনাহ! তারা দেখতে পায়, আরও অনেক বন্দুকধারী হারামাইনে প্রবেশ করেছে। তাদের হাতে ছিল সেই খাটিয়াগুলোতে করে নিয়ে আসা অস্ত্রশস্ত্র। এসময় মসজিদুল হারামের বিশেষায়িত পুলিশ বাহিনী (তাদের একমাত্র অস্ত্র ছিল প্রহার করার লাঠি) কোথাও কোথাও অস্ত্রধারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এরপরই দুজন পুলিশকে গোটের কাছে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এটা দেখতে পেয়ে অন্যান্য পুলিশ অফিসারও ধীরে ধীরে কেটে পড়ে।

এই হট্টগোলের মাঝেই অস্ত্রধারীদের নেতা জুহাইমান আল-উতাইবি মসজিদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন। চুম্বকের মতো কালো চোখ, পাতলা ঠোঁট এবং কোঁকড়া দাড়ির সাথে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলের অধিকারী তেতাল্লিশ বছর বয়সী এই বেদুইন আলেমের উচ্চতা ছিল গড়পড়তার চেয়ে কম। তবুও

তার মাঝে একটি কর্তৃত্বপরায়ন ভাব ছিল। তার পরনে ছিল লম্বা সুন্নতি সাদা পোশাক। অন্যান্য বন্দুকধারীদের মতো তার মাথাতেও কোনো টুপি ছিলনা। একটি হালকা সবুজ চুলের ব্যান্ড যেনো তার এলোমেলো চুলগুলোকে বাধ্যগত করার আশ্রয় চেষ্টা করে যাচ্ছিল। রাইফেল, পিস্তল ও ছোরা সম্বলিত তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে জুহাইমান ভিড়ের মধ্যে হাত দিয়ে পথ তৈরি করে পবিত্র কাবার ইমামের দিকে এগিয়ে যান।

কাবার ইমাম তখন সবেমাত্র নামাজ শেষ করে পেছনে ফিরেছিলেন। জুহাইমান এবং তার সাথীদের দেখে প্রথমত তিনি কোনো বিপদের আশঙ্কা করেননি। কাছাকাছি আসার পর তিনি চিনতে পেরেছিলেন যে, জুহাইমান ও তার সাথী একসময় তার ছাত্র ছিল। তবে সেই অনুভূতি কয়েক সেকেন্ড উধাও হয়ে গিয়েছিল। কারণ জুহাইমান অনাড়ম্বরভাবে তাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে মাইক্রোফোনটি নিয়ে নেন। ইমাম এসময় মাইক্রোফোনটি ফেরত নেয়ার চেষ্টা করলে জুহাইমানের এক সাথী তার বুকে ছুরিকাঘাত করতে উদ্যত হয়!

এসব দেখে মুসল্লিদের মাঝে একটা সূক্ষ্ম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জুতা হাতে হাজার হাজার লোক তখন মসজিদের দরজার দিকে ছুটে যায়। কিন্তু তারা দেখতে পায়, মসজিদুল হারামের একান্নটি দরজাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং বন্দুকধারীরা সেসব দরজা পাহারা দিচ্ছে। কী করা উচিত বুঝতে না পেয়ে মুসল্লিরা তখন ‘আল্লাহ্ আকবর’ স্লোগান দেয়া শুরু করে। কিন্তু বন্দুকধারীরাও অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের সাথে যোগ দেয়। ‘আল্লাহ্ আকবর’ স্লোগান আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

স্লোগানের তীব্রতা কিছুটা কমে আসলে জুহাইমান মাইক্রোফোনে তার অনুসারীদের বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া শুরু করেন। নির্দেশনা মোতাবেক সেসব প্রশিক্ষিত বিদ্রোহীরা কম্পাউন্ডজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। হারাম শরিফের সাতটি মিনারের ওপর মেশিনগান ও স্নাইপার মোতায়েন করা হয়। আটকে পড়া মুসল্লিদেরকেও এসময় সাহায্য করার জন্য বলা হয়। এই সাধারণ মুসল্লিদেরকে তখন মসজিদের ভারী কার্পেটগুলো গুটিয়ে তালাবদ্ধ দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়েছিল। আবার সামর্থ্যবান যুবকদের দিয়ে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে মিনারের চূড়ায় উঠে জুহাইমানের লোকদের খাবার পানি ও গোলাবারুদের ক্রেট

সরবরাহের কাজ করানো হয়। দ্রুতই ইসলামের পবিত্রতম স্থানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে আসে জুহাইমান ও তার অনুসারীদের হাতে।

৮৯ মিটার (২৯২ ফুট) দীর্ঘ মিনারগুলো থেকে প্রায় সম্পূর্ণ মক্কাই দৃষ্টিগোচর হতো। এজন্য হারাম শরিফের চারিদিকের বিশাল এলাকা জুহাইমানের স্নাইপারদের আওতায় চলে আসে। ট্রিগারে হাত দিয়ে সম্ভাব্য শত্রুর খোঁজে সবগুলো রাস্তার দিকে সেই স্নাইপাররা নজর রাখছিল। মাইক্রোফোনে জুহাইমান তার স্নাইপারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, “যদি সৌদ পরিবারের কোনো সৈনিক এগিয়ে আসার চেষ্টা করে, তবে তার প্রতি কোনোপ্রকার দয়া প্রদর্শন করা যাবে না। একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তার দিকে গুলি চালাতে হবে।”

এদিকে সেখানে উপস্থিত সৌদি নাগরিকরাও সবকিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। আর হাজার হাজার জিম্মিদের মাঝে অগণিত ভিনদেশী তো ছিলই। তাদের সিংহভাগই আরবি জানত না। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মাঝে তারা আরবি জানা স্বদেশীদের থেকে ঘটনা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছিল। তবে বিদ্রোহীরা এই ভাষাগত সমস্যার বিষয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। শীঘ্রই তারা মসজিদের একপাশে পাকিস্তানি ও ভারতীয়দের একত্রিত করে। এরপর জুহাইমানের একজন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অনুসারী তাদের কাছে উর্দুতে জুহাইমানের ঘোষণার ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে আফ্রিকানদের নিকট একজন ইংরেজি বক্তা সবকিছু ব্যাখ্যা করছিল। মুসল্লিরা প্রাথমিক ভয় কাটিয়ে ওঠার পর এই বিদ্রোহীরা ঘোষণা করে, হারাম শরিফের পাশাপাশি সৌদি আরবের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং দেশটির দুটি পবিত্রতম শহরও তাদের হস্তগত হয়েছে! ‘মক্কা, মদিনা এবং জেদ্দা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে!’—মসজিদের মাইকের সেই ঘোষণা মক্কার বিস্তৃত এলাকাজুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

তারপর জুহায়মান ধ্রুপদী আরবি বলায় পারদর্শী একজন সহকারীর হাতে মাইক্রোফোন তুলে দেন। তাদের এই দুঃসাহসিক উদ্যোগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য সেটাই ছিল উপযুক্ত সময়। পরবর্তী ঘটাজুড়ে হারাম শরিফের লাউডস্পিকারগুলো বিশ্বের এক বিলিয়ন মুসলমানের উদ্দেশে বিদ্রোহের বার্তা প্রচার করে। ঘোষণা করা হয়, “অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে এবং চূড়ান্ত সময় উপস্থিত হয়েছে।” বক্তৃতার মাঝে মাঝে

গুলির শব্দও শোনা যায়। বক্তৃতা শেষ হলে লাইউডস্পিকারগুলো নীরব হয়ে যায় এবং মক্কাজুড়ে একটি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি মসজিদের কাছের ক্যাফেগুলো থেকে ওয়েটাররা পালিয়ে যায়।



এভাবেই একটি নগ্ন লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটে। মক্কার এই রক্তপাত ইসলামী বিশ্বের পাশাপাশি পশ্চিমকেও একটি সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছিল। এই ঘটনা বিশ্বব্যাপী চরম কূটনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে এবং মক্কা থেকে হাজার মাইল দূরেও সহিংসতা ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হারাম শরিফ পুনরুদ্ধারে সৌদ পরিবারের সাথে সাথে জড়িয়ে পড়তে হয় মার্কিন পাইলট এবং ইউরোপীয় কমান্ডোদেরও। সংকটের শুরুতেই আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের মাঝে নিজেদেরকে সর্বোচ্চ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খুঁজে পায়। সৌদি আরবসহ অনেক মুসলিম দেশ ইতিহাসের পাতা থেকে এই অধ্যায়টিকে একরকম মুছে ফেললেও সেই সংকটের রেশ আজও রয়ে গেছে।

হারাম শরিফে জুহাইমানের হঠকারী অভিযানের জবাবে সৌদি শাসকগোষ্ঠীর পাল্টা পদক্ষেপগুলো ছিল ঔদ্ধত্য, অযোগ্যতা আর চরম উদাসীনতায় ভরা। এই ব্যর্থতা আল-সৌদ পরিবারের ভাবমূর্তিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। সৌদি আরব ও এর বাইরের বহু মুসলমানের মনে তাদের প্রতি আনুগত্যের ফাটল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনই একজন ছিলেন তরুণ ওসামা বিন লাদেন! তিনি এবং তার সহযোগীরা পরবর্তী সময়ে সৌদ পরিবার ও তাদের মার্কিন পৃষ্ঠাপোষকদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নেমেছিলেন। যে উগ্র মতাদর্শ জুহাইমানদের ইসলামের পবিত্রতম স্থানে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে উসকে দিয়েছিল, সময়ের আবর্তে সেটা আরও উগ্র রূপ নেয়। সর্বোপরি, এর চূড়ান্ত রূপটিই ছিল আল-কায়েদা।

অদ্ভুতভাবে, স্নায়ুযুদ্ধের ডামাডোলে এই মতাদর্শই কিনা মার্কিন নীতিনির্ধারক এবং সৌদ পরিবারের কাছে উপকারী বলে মনে হয়েছিল। তাই দমন করার পরিবর্তে একে আরও উৎসাহিত করা হয় এবং ১৯৭৯ সালের পর এই মতাদর্শ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়। এই মতাদর্শের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীরাই বর্তমানে চারটি মহাদেশজুড়ে বিমান, পর্যটন হোটেল এবং ট্রেন উড়িয়ে দিতে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত রয়েছে।

সেই সময়ের মক্কা সংকটের গুরুত্ব তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকদের চোখও এড়িয়ে গিয়েছিল। তারা মূলত পশ্চিম বিশ্বকে ঘিরে থাকা অন্যান্য সংকট নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অথচ আধুনিক যুগে কোনো আন্তর্জাতিক জিহাদি সংগঠনের প্রথম বড় ধরনের অভিযান ছিল এই হারাম শরিফ দখল। তখন একে স্রেফ সৌদি আরবের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এটি সৌদি বেদুইনদের আরেকটি নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে অচিরেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নাইন-ইলেভেন ট্রাজেডি, মাদ্রিদ ও লন্ডনের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে বোমা হামলা এবং ইরাক ও আফগানিস্তানকে তছনছ করে দেওয়া ভয়াবহ সহিংসতা, এই সবকিছুরই সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৭৯ সালের নভেম্বরের এক তপ্ত সকালে—‘কাবা শরিফের প্রাঙ্গণে’।

(এক)

জুহাইমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাইফ আল-উতাইবি তার অনুসারীদের নিয়ে আক্ষরিক অর্থেই মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রের দখল নিয়েছিলেন। হারাম শরিফের কেন্দ্রস্থিত কালো গিলাফে আবৃত কাবা তথা বাইতুল্লাহর দিকে ফিরেই সারাবিশ্বের মুসলমানরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। উল্লেখ্য, সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার হজ করা ফরজ। এসময় তারা দুই টুকরো ইহরাম পেঁচিয়ে কাবার চারিপাশ প্রদক্ষিণ করেন। জুহাইমান দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আগপর্যন্ত সূর্যের চারপাশে গ্রহসমূহের আবর্তনের মতোই হাজিরা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা এই কাবা প্রদক্ষিণ করছিলেন। হাদিস অনুযায়ী, জান্নাত ও পৃথিবীর অক্ষ বরাবর অবস্থিত হারাম শরিফে এক রাকাত নামাজের সওয়াব অন্য জায়গার এক লক্ষ রাকাত নামাজের সমান। এছাড়াও এই কাবার দিকে মুখ করেই মৃতদের দাফন করা হয়।

হাদিস অনুসারে, প্রায় ষোল মিটার উচ্চতা এবং বারো মিটার দৈর্ঘ্যের (প্রায় ৫২.২ ফুট x ৪০ ফুট) এই সাধারণ পাথরের কাঠামোটি হাজার হাজার বছর আগে মুসলমানদের (এবং ইহুদিদেরও) আদিপিতা হযরত ইব্রাহিম ﷺ নির্মাণ করেছেন (বাইবেলে তাকে ‘আব্রাহাম’ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে)। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মতে, আব্রাহামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হলেন ইহুদিদের পূর্বপুরুষ আইজ্যাক (ইসহাক)—যাঁর জন্ম হয়েছিল আব্রাহামের স্ত্রী সারার গর্ভে। অন্যদিকে মুসলমানদের মতে, ইব্রাহিমের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হলেন আরবদের পূর্বপুরুষ এবং মিশরীয় স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাইল ﷺ।

হাদিস অনুসারে, আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহিম ﷺ তার স্ত্রী হাজেরা এবং শিশুপুত্র ইসমাইল ﷺ কে মক্কায় রেখে যান। সেই সময় মক্কা ছিল পুরোপুরি একটি অনুর্বর মরুভূমি। সেখানে এমনকি কোনো পানির কূপও ছিল না।

পিপাসার্ত শিশুর কষ্ট দেখে মা হাজেরা পানির খোঁজে তখন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেন। কোথাও পানি না পেয়ে যখন তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন, ঠিক তখনই শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে মাটি ফুঁড়ে পানি বের হতে শুরু করে। এটিই ছিল জমজম কূপের সূচনা। এর পানি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত বরকতময়। হাজেরার স্মৃতি রক্ষার্থে হাজিরা আজও সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার আসা-যাওয়া (তাওয়াফ) করেন। তবে বর্তমানে এই দুটি পাথুরে পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গাটি টাইলস দিয়ে বাঁধানো ও ছাউনিযুক্ত।

কাবা সংলগ্ন অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল দিয়ে ঘেরা অংশটির নাম ‘হাতিমে কাবা’। কিছু ঐতিহাসিক বিবরণী অনুসারে, বিবি হাজেরা এবং পরবর্তীতে হযরত ইসমাইল ﷺ-কে এই হাতিম অংশের ভেতরে সমাহিত করা হয়েছে। এই জায়গাটুকু ‘হিজরে ইসমাইল’ (ইসমাইলের কোল বা আঙিনা) নামেও পরিচিত। কারণ, হযরত ইব্রাহিম ﷺ যখন তার স্ত্রী ও সন্তানকে এখানে রেখে যান, তখন এটিই ছিল তাদের থাকার জায়গা বা বাসস্থান। এছাড়াও কাবার পাশেই একটি সোনালী খাঁচার নিচে ইব্রাহিম ﷺ-এর পায়ের ছাপ সম্বলিত একটি পাথর সংরক্ষিত আছে। এর নাম—‘মাকামে ইব্রাহিম’। এই পাথরের ওপর দাঁড়িয়েই ইব্রাহিম ﷺ আদম ﷺ-এর তৈরি করা আদি মসজিদের ভিত্তির ওপর কাবা ঘরটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বন্যার কারণে কাবার মূল কাঠামোটি কয়েকবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে প্রতিবারই ঠিক একই জায়গায় কাবাকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। মক্কার আরবরা একসময় একে নিজেদের মূর্তিপূজার আখড়াও বানিয়েছিল। কাবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রূপালী রিমে বাঁধানো একটি কালো পাথর রয়েছে। বলা হয়, এই পাথরটি একসময় ধবধবে সাদা ছিল। কিন্তু প্রতি বছর একে স্পর্শ ও চুম্বন করা লক্ষ লক্ষ হাজির পাপকে শোধন করে এটি কালোবর্ণ ধারণ করেছে।

ইসলামের আবির্ভাবের আগের কয়েক শতাব্দী যাবৎ মক্কার কুরাইশ গোত্র কাবা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। এর সুবাদে মক্কার আসা হাজিদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারা বেশ সচ্ছল জীবন কাটাত। তবে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে তাদের এই ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি হুমকির মুখে পড়ে। কাবার এই গুরুত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে ইয়েমেনের খ্রিস্টান শাসক আবরাহা একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করে। শুধু

তাই নয়, এরপর কাবা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সে এক বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান চালায়। তার ধারণা ছিল, কাবা ধ্বংস হয়ে গেলে সবাই তার তৈরি গির্জায় তীর্থযাত্রা করতে বাধ্য হবে। আতঙ্কিত মক্কাবাসীরা তখন কাবার নিরাপত্তার ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোতে আশ্রয় নেয়। ঠিক তখনই আকাশে একঝাঁক পাখির আগমন ঘটে। এই পাখিগুলো তার বাহিনীর ওপর মটরদানার মতো ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এর ফলে সেই শক্তিশালী হস্তিবাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে তাদের এই অবস্থাকে ‘চর্চিত ঘাসের মতো’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে (সূরা ফীল)

সেই বছরই কুরাইশ গোত্রে মুহাম্মাদ (ﷺ) নামে এক শিশুর জন্ম হয়। তিনি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হন, তখন ফেরেশতা জিবরাইল ﷺ আল্লাহর ওহী নিয়ে তাঁর কাছে আসেন। ইসলামের একত্ববাদী বিশ্বাস অনুযায়ী, মূর্তিপূজা ছিল সবচেয়ে বড় পাপ। কিন্তু যখন তিনি মক্কাবাসীদের মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানান, তখন অনেকেই তার শত্রু হয়ে ওঠে। তাদের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত তিনি ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার উত্তরের ইয়াসরিবে (বর্তমান মদিনা) হিজরত করতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য, এই দিনটি থেকেই হিজরি সাল গণনা শুরু হয়। এই বর্ষপঞ্জি চাঁদের ওপর নির্ভরশীল এবং এতে মোট ৩৫৪টি দিন রয়েছে। হিজরতের পর মদিনাতেই বিশ্বের প্রথম শরিয়াহ ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। হিজরতের আট বছর পর নবী মুহাম্মাদ ﷺ বিজয়ী বেশে মক্কায় ফিরে আসেন। তিনি কাবার ভেতরের সব মূর্তি ভেঙে ফেলেন এবং অমুসলিমদের মক্কা ও মদিনা থেকে বিতাড়নের অসিয়ত করে যান। অমুসলিমদের ওপর তাঁর সেই নির্দেশ আজও বহাল রয়েছে।

ইতিহাসের অধিকাংশ সময় মক্কা পুরোপুরিভাবে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে আবরারাহর হস্তিবাহিনীর অভিযানের পর শহরটি প্রথম বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়ে ১১৮২ সালে। ক্রুসেডার রাজপুত্র রেনল্ড ডি শ্যাতেলিয়ন তখন জর্ডানের দুর্গ থেকে লোহিত সাগরের আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ চালাচ্ছিল। একইসাথে সে মক্কাগামী কাফেলাগুলোতে অতর্কিত হামলা শুরু করে। এমনকি সে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পবিত্র দেহ চুরির জন্য মদিনায় একটি বিশেষ বাহিনী পাঠানোর পরিকল্পনা করে। তবে সেই বাহিনী কখনো মদিনাতেই পৌঁছাতে পারেনি। ১১৮৭ সালে জেরুসালেম বিজেতা সুলতান

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে হাতিনের যুদ্ধে সে বন্দি হয়। তার এমন ঔদ্ধত্যের শাস্তি হিসেবে সালাহউদ্দিন সেদিন নিজ হাতে তার শিরশ্ছেদ করেছিলেন।

এছাড়াও, ১৯৭৯ সালের আগে কারামাতি শিয়া সম্প্রদায় বলপ্রয়োগ করে হারাম শরিফ দখল করতে পেরেছিল। ৯২৯ সালে কারামাতিরা হারাম শরিফে আচমকা হামলা চালিয়ে ‘হাজরে আসওয়াদ’ বা পবিত্র কালো পাথরটি খুলে নিয়ে যায়। সেটিকে তারা পূর্ব আরবের হিজর শহরে স্থাপন করে। তাদের ধারণা ছিল, হাজরে আসওয়াদের টানে মানুষ মক্কার বদলে হিজর শহরেই হজ্জ করতে আসবে। তবে তাদের এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। অবশেষে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতী বিল্লাহর ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার (দিনার) বিনিময়ে দীর্ঘ বাইশ বছর পর কারামাতিরা হাজরে আসওয়াদকে পুনরায় আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেয়।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আরবের বিশাল মরুভূমিতে বসবাসকারী যাযাবর বেদুইনরা আবার বিভিন্ন পৌত্তলিক বা মূর্তিপূজার আচারে লিপ্ত হতে শুরু করে। নিজেদের মুসলিম দাবি করলেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কবর, পাথর ও পুরনো গাছের পূজা করত। কিন্তু আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাদেরকে ওয়াহাবিদের মুখোমুখি হতে হয়। মূলত বিরোধীরাই মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের অনুসারীদের ‘ওয়াহাবি’ নামে ডাকত। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের (১৭০৩-১৭৯২) লক্ষ্য ছিল একেবারে সোজাসাপ্টা। আর তা হলো, নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং সাহাবীদের খাঁটি ইসলামি আকিদা ও সুন্যাহর পুনর্জাগর। তিনি ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা এবং ইউরোপ প্রভাবিত মুসলিম সংস্কৃতি ও দর্শনকে ধর্মবিরোধী উদ্ভাবন তথা ‘বিদআত’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ওয়াহাবি আলেমদের মতে, মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে জেঁকে বসা খ্রিস্টান শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য ফরজ। এছাড়া ইরান, দক্ষিণ ইরাক এবং পারস্য উপসাগরীয় উপকূলের শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকেও তারা নিজেদের প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করত। শিয়াদের ব্যাপারে তাদের স্পষ্ট ফতোয়া ছিল যে, হয় তাদের সুন্নি মতাদর্শ গ্রহণ করতে হবে, না হলে চরম পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।

এই ওয়াহাবিরা ছিল সুন্নি মুসলিম। ইসলামের শুরুর দিকে নেতৃত্ব বা উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধের জেরে সুন্নি ও শিয়া বিভাজনের উৎপত্তি হয়েছিল।

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওফাতের পর শিয়াদের পূর্বসূরীরা দাবি করেছিল যে, মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর জামাতা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং এরপর তাঁর নাতি হাসান ও হোসাইনেরই প্রাপ্য। কিন্তু সুন্নিদের পূর্বসূরীরা অন্যান্য সাহাবীদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই দুই পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু যুদ্ধের ফলে একটি বড় ধরনের ধর্মীয় ও আদর্শিক বিভাজন তৈরি হয়। এই বিভাজন আজও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখ্য, আরবের মরুভূমির প্রান্তে থাকা শিয়া শহরগুলোই ওয়াহাবিদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিল না। আব্দুল ওয়াহাবের এই কঠোর মতাদর্শ মেনে নিতে অস্বীকার করা সুন্নিদেরও তারা ছদ্মবেশী কাফের মনে করত।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের একজন প্রাথমিক সমর্থক ছিলেন নজদের গোত্রপ্রধান মুহাম্মাদ ইবনে সৌদ (১৬৮৭-১৭৬৫)। একসময় ইবনে সৌদের সামরিক শক্তি এবং আব্দুল ওয়াহাবের ধর্মীয় ব্যাখ্যার সমন্বয়ে নজদ খুব দ্রুতই আরব উপদ্বীপের একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। ইবনে সৌদের উত্তরসূরীরা এরপর শক্তিশালী উসমানী খেলাফতকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস দেখায়। ১৮০২ সালে উসমানী খেলাফতের অধীনে থাকা ইরাকের কারবালা শহর সংলগ্ন মরুভূমি থেকে ইবনে সৌদ ও ওয়াহাবি যোদ্ধাদের একটি ভয়ংকর বাহিনী আবির্ভূত হয়। নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাতি ইমাম হোসাইনের সমাধিস্থল কারবালা শহরটি ছিল শিয়া ধর্মমত ও তীর্থযাত্রার প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া শহরটি বিপুল ধন-সম্পদে পূর্ণ ছিল। পারস্য, ভারত ও আশপাশের অঞ্চলের শিয়া মুসলমানরা শত শত বছর ধরে সেগুলো কারবালায় জমা করেছিল। তবে সেই তুলনায় শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল একেবারেই দুর্বল। এই লড়াইয়ে ওয়াহাবি যোদ্ধারা শিয়াদের প্রতি কোনো দয়া দেখায়নি। একটি বিবরণ অনুযায়ী, সেদিন কারবালার প্রায় চার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলেন। বলা হয়, কারবালা থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ নজদের মরুভূমিতে নিয়ে যেতে তাদের চার হাজার উটের প্রয়োজন হয়েছিল।

এর পরের বছরই আসে মক্কার পাল্লা। কারবালার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত মক্কাবাসীরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করাকেই বেঁচে নিয়েছিল। এরপর ওয়াহাবীরা মক্কার সব মাজার বা সমাধি মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। এর কিছুদিন পর তারা মদিনা দখল করে এবং সেখানেও একইভাবে সব মাজার ধ্বংস করে দেয়।